স্বামী সত্যপতি পরিব্রাজক

বাংলাদেশ অগ্নিবীর

ওওম্

উপদেশ বিন্দু

প্রবক্তা:
পূজ্যপাদ স্বামী সত্যপতি পরিব্রাজক

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা:
শ্রী দীপংকর সিংহ দীপ

স্বাধ্যায় প্রকাশনী
বাংলাদেশ অগ্নিবীর

উপদেশ বিন্দু [মূল: প্রেরক বাক্য]
স্বামী সত্যপতি পরিব্রাজক
অনুবাদ: দীপংকর সিংহ দীপ

প্রকাশকাল: আগস্ট, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

প্রচ্ছদ: শ্রী জনি আর্য

মূল্য:

ওঽম্

পূজ্যপাদ স্বামী সত্যপতি পরিব্রাজকের সাধনালব্ধ উপদেশ সাগরের অত্যন্ত ক্ষুদ্র সংকলন এই **'উপদেশ বিন্দু'**। নবীন সাধক ও ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে যদি কিঞ্চিত প্রভাব রাখতে সক্ষম হয় এবং **ভগবৎপ্রাপ্তির পথে সহায়ক** হয় তবেই অনুবাদের সার্থকতা। **সফলতার সর্বকৃতিত্ব পরমেশ্বরের**, পাশাপাশি অনুবাদ-ব্যাখ্যায় ক্লিষ্টভাব কিংবা ভ্রান্তি একান্তই অনুবাদকের নিজস্ব। ব্রহ্মকৃপা সকলের প্রতি বর্ষিত হোক।

শ্রীচরণে বিনীত

দীপংকর সিংহ দীপ

অনুক্রমণিকা

ওঁতম্

জীবনের লক্ষ্য

১। মানবজীবনের চূড়ান্ত ও পরম লক্ষ্য শাস্ত্রকারেরা ঈশ্বর উপলব্ধিকেই বলেছেন। কারণ সমস্ত জীবই পরিপূর্ণ ও চিরস্থায়ী সুখ চায় এবং দুঃখ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত হতে চায়। এই অবস্থা কেবল ঈশ্বর লাভের মাধ্যমেই সম্ভব। অন্য কোনো লক্ষ্য অর্জনের দ্বারা এই আনন্দ লাভ হতে পারে না।

[শাস্ত্রকারগণ একবাক্যে ঘোষণা করেছেন মানবজীবনের চূড়ান্ত ও পরম উদ্দেশ্য হলো ঈশ্বরোপলব্ধি। কারণ প্রতিটি জীব সচেতনভাবে হোক কিম্বা অচেতনভাবে, পরিপূর্ণ, নিরবিচার ও চিরস্থায়ী সুখ লাভের জন্যই সকল কর্মে রত। দুঃখ থেকে মুক্তি ও তৃপ্তির যে চূড়ান্ত অবস্থা, তা কেবল পরম সত্য ঈশ্বরের সান্নিধ্য ও উপলব্ধির মাধ্যমেই সম্ভব। ইন্দ্রিয়সুখ, ভোগ, প্রতিপত্তি, বিদ্যা কিম্বা সামাজিক সাফল্য এসবের মধ্য দিয়ে ক্ষণিক আনন্দ আসলেও, তা কখনোই নিত্য ও নির্মল সুখের প্রতিস্থাপক নয়।

এইজন্যই উপনিষদ (ছান্দোগ্য০ ৭.২৩.১) ঘোষণা করে 'যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি' অর্থাৎ, "যে অনন্ত, সেই সুখ; ক্ষুদ্রের মধ্যে কখনোই সত্যসুখ নেই।" এই অনন্তস্বরূপ ভগবানকেই লাভ করতে পারা, এবং তাঁতেই আত্মাকে স্থির করতে পারা এই হল মোক্ষ, এই হল মানবজীবনের সার্থকতা। অন্য যেকোনো লক্ষ্য অর্জন, এই মহালক্ষ্যের তুলনায় গৌণ ও অসার।][1]

[1] আমার নিজস্ব ব্যাখ্যাভাগ তৃতীয় বন্ধনীর দ্বারা উপদেশের পর প্রদান করা হয়েছে।

২। যদিও মানবজীবন সত্য-মিথ্যা জানার ও জানানোর এবং তারপরে সত্য গ্রহণ ও মিথ্যা বর্জনের জন্য তবুও এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দুঃখ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া ও বিশুদ্ধ ও স্থায়ী সুখ লাভ করা।

[সাধারণ মানুষ প্রায়ই বলে 'কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা জেনে কী হবে? না জেনেও তো ভালোই আছি!' কিন্তু ধর্মদর্শন বলে, **আত্মশুদ্ধি** এবং **মোক্ষপ্রাপ্তির** পথে এটি একটি মৌলিক প্রয়োজন। কারণ, **সত্যই ধর্ম** এবং **মিথ্যা হল অধর্ম**। শাস্ত্রসম্মত জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই সত্যকে উপলব্ধি করা, যা চিরস্থায়ী, কল্যাণকর এবং মুক্তির পথপ্রদর্শক। যেটি সত্য, সেটি গ্রহণযোগ্য কারণ তা আমাদের আত্মাকে উন্নতির দিকে নিয়ে যায়; আর যেটি মিথ্যা, তা বন্ধন ও ভ্রান্তির কারণ। সেইজন্য তা পরিত্যাজ্য।
শুধু নিজের জন্য নয়, সমাজে জ্ঞান-অজ্ঞান, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য স্পষ্ট করা ও প্রচার করা প্রতিটি জ্ঞাতসত্ত্বার কর্তব্য। কেননা, একজনের **সচেতন বর্জন** ও **সত্যানুগ গ্রহণ** অন্যকেও উত্থানের পথে উৎসাহিত করে। এইভাবেই ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েই ধর্মপথে অগ্রসর হয়।]

৩। বছরের পর বছর আমাদের ভাবনা-চিন্তার বিষয় এই হওয়া উচিত যে, 'মানবজীবনের সাফল্য কোথায় ?' এর উত্তর নির্ণয় করি, যাবতীয় সংশয় দূর করি এবং সেই অবস্থাকে দৃঢ় করি। তবেই মোক্ষপ্রাপ্তির পথে চলা সম্ভব।

[একজন বোধসম্পন্ন মানুষের চিন্তার প্রধান বিষয় হওয়া উচিত **'মানবজীবনের সাফল্য ও উদ্দেশ্য কী?'** এই প্রশ্নকে বছরের পর বছর ধরে অন্তরে ধারণ করে, গভীর চিত্তচিন্তায় এর উত্তর অনুসন্ধান করা ধর্মজীবনের সূচনা। জীবনের নানা ভ্রান্ত আসক্তি, মোহ, আরামপ্রবণতা আমাদের মনে সংশয় সৃষ্টি করে কিন্তু সেই সংশয় দূর না করলে আত্মোপলব্ধি অসম্ভব। তাই শাস্ত্রবাণী, গুরুবাক্য এবং তপস্যার সহায়তায় সত্য অনুসন্ধান করে আমাদের উচিত সেই **সিদ্ধ**

অবস্থাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করা যা সন্দেহাতীত, চিরস্থায়ী, ও কল্যাণময়। এই দৃঢ় উপলব্ধিই আমাদের **মোক্ষের পথে** স্থাপন করে যেখানে ব্যক্তি আত্মা সকল বন্ধন ছিন্ন করে সত্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব, আত্মজিজ্ঞাসা ও সত্যবোধের এই নিরবচ্ছিন্ন সাধনাই মানবজীবনকে সার্থক করে তোলে।]

৪। প্রেয় পথে দুঃখ ও মানবজীবনের ব্যর্থতা আছে, এবং শ্রেয় পথে সুখ ও মানবজীবনের সাফল্য। যোগাভ্যাসীর মনে এই অনুভূতি সর্বদা থাকা উচিত। এর ফলে তার মোক্ষপ্রাপ্তির লক্ষ্য স্থির থাকবে।

[প্রেয় অর্থাৎ যা জাগতিক বস্তু, আমাদের ভালো লাগে কিন্তু জন্ম-মৃত্যু ও দুঃখের বন্ধনে আবদ্ধ করে। আর শ্রেয় হলো যা আমাদের জন্য প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলময়, মানবিকার সর্বোচ্চ স্তর ও পারমার্থিক কল্যাণ প্রদান করে]

৫। ব্রহ্মপ্রাপ্তির লক্ষ্য সামান্য জ্ঞান বা সামান্য চিন্তার মাধ্যমে নির্ধারিত হয় না। বহু বছর ধরে নানা প্রমাণ দ্বারা তা যাচাই করতে হয়।

[ব্রহ্মপ্রাপ্তি অর্থাৎ পরমাত্মার উপলব্ধি এমন একটি লক্ষ্য, যা কোনোক্রমেই সামান্য জ্ঞান বা অল্প কিছু ভাবনার মাধ্যমে নির্ধারিত হতে পারে না। এটি কেবল একটি মত বা আকাঙ্ক্ষা নয় বরং একটি চূড়ান্ত সত্য, যা উপলব্ধি করতে হয় গভীর চিন্তন, শাস্ত্রবিচার এবং দীর্ঘকালব্যাপী অন্তরানুসন্ধানের মাধ্যমে। কেন উপনিষদে (২.১) সদ্‌গুরু বলেন, ‘যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতম্’ অর্থাৎ এই ব্রহ্মের যে স্বরূপ বিদ্বানগণ বিদ্যাপ্রকাশ দ্বারা জ্ঞাত হয়েছেন, তা তোমার জন্য **তর্ক-বিতর্ক তথা যুক্তি দ্বারা বিচার করার যোগ্য-এরূপ** আমি মনে করি। সুতরাং, ব্রহ্মতত্ত্বের যে ধারণা গড়ে উঠবে, তা যেন কেবল বিশ্বাসনির্ভর না হয়, বরং তা যেন যুক্তি, শাস্ত্র, অভিজ্ঞতা ও সাধনার দ্বারা বহুবার যাচাই করা হয়। এই দীর্ঘ পরীক্ষাই

একসময় আমাদের মনের যাবতীয় সংশয় দূর করে, ও স্থির করে দেয় কোন পথ প্রকৃতপক্ষে মোক্ষ বা চূড়ান্ত কল্যাণের দিক নির্দেশ করে। অতএব, **ব্রহ্মলক্ষ্য স্থির করা মানেই সত্যসন্ধানীর দীর্ঘ ও গভীর যাত্রা শুরু** করা।]

৬। অনেক সময় ব্যক্তি আবেগবশতও ব্রহ্মবেত্তা হওয়ার লক্ষ্য স্থির করে। প্রমাণ যাচাই না করে, নিজের প্রতিবন্ধকতা বা সহায়ক পরিস্থিতি নির্ধারণ না করে, নিজের সক্ষমতা না জেনে এমন সিদ্ধান্ত স্থায়ী হয় না।

৭। ঈশ্বরপ্রাপ্তিকে লক্ষ্য হিসেবে নিলেন, যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা করলেন, যথেষ্ট সিদ্ধান্তও নিলেন, তবুও আপনার কিছু না কিছু ব্যক্তিগত ত্রুটি থাকবেই। নিজেকে দেখতে থাকুন, ঘাটতি প্রকাশ পাবে এবং দেখতে থাকুন আরও ঘাটতি দেখা দেবে।

[পরমার্থে উন্নীত হতে হলে মানুষকে **নিরন্তর আত্মপরীক্ষা** করতে হয়। জীবনের প্রতিটি কর্ম, চিন্তা ও অনুভূতির উপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। এটাই সত্য সাধনার গোড়ার কথা। নিজের ভিতরের কাম, ক্রোধ, অহং, হিংসা, লোভ ইত্যাদি দোষগুলো চিহ্নিত করে ধীরে ধীরে তা দূর করার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকাই প্রকৃত ধর্মপথ। আত্মদোষমুক্তির এই সাধনাই ব্যক্তিকে **অন্তঃশুদ্ধি** দান করে, যার মাধ্যমে সে **ভগবানের যোগ্য ভক্ত** হয়ে ওঠে।

উপনিষদে [মু০ উ০ ৩.২.৪] বলা হয়েছে ‘নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ’ অর্থাৎ দুর্বলচেতা আত্মার উপলব্ধি করতে পারে না। তাই নিজের ভিতরে লুকিয়ে থাকা সব দুর্বলতা ও অপবিত্রতাকে দূর করতে হবে। এই আত্মশুদ্ধির পথই আপনাকে **ভগবৎ-প্রাপ্তি বা মোক্ষের** দিকে সহায়তা করবে। আত্মনিরীক্ষণ আর আত্মশোধনই ভক্তির প্রকৃত ভিত।]

৮। সংঘর্ষ করে গেলে পরবর্তীতে এই বৈরাগ্য/মোক্ষের লক্ষ্যই অত্যন্ত প্রিয় লাগবে, তাতেই সুখ পাবেন। এর বিপরীত জিনিসগুলো খুবই ক্ষতিকর ও যন্ত্রণাদায়ক লাগবে। এমন দৃঢ়তা আসবে।

[যে ব্যক্তি নিজেদের জীবন থেকে সমস্ত তামসিকতা, নেতিবাচক চিন্তাভাবনা বা আচার-আচরণ ত্যাগ করেছে এবং বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক জীবন পালন করছে এমন এক সময় আসবে যখন কিনা পূর্বে যে জিনিসগুলোর আসক্তি থেকে তার মুক্ত হতে কষ্ট হতো সেগুলোই এখন আর ভালো লাগবে না।]

৯। যে ব্যক্তি প্রাচীন ঋষিদের ও বর্তমান ব্যক্তিদের লক্ষ্য তুলনা করে না, সে বিভ্রান্ত হবে।

[এটিই আর্ষসিদ্ধান্ত। ঋষিরা বৈদিক শাস্ত্রে যে নিয়মাবলী দিয়েছেন সেগুলো পালন না করে যদি আমরা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানুষের নিজের বানানো বিধিবিধান অনুসরণ করতে থাকি তবে এই দুর্লভ মানবজন্ম নষ্ট হবে। তাই আমাদের উচিত ঋষিদের দেখানো পথে চলা যেন আমরা পথভ্রষ্ট না হই এবং ভগবানকে লাভের দিকে এগিয়ে যাই।]

১০। প্রধান লক্ষ্য ঈশ্বরপ্রাপ্তি রাখলে, যম-নিয়ম পালনেও অতিশ্রদ্ধা ও প্রেম জন্মায়।

[যম-নিয়ম ইত্যাদি অষ্টাঙ্গযোগ সাধারণ মানুষের কাছে অনেক কঠিন বলে মনে হতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে এটা চিন্তা না করে যে আমার যাবতীয় তপস্যার মূল কারণ আমি ভগবানকে লাভ করতে চাই ততক্ষণ পর্যন্ত সাধনার পথ কঠিন মনে হবে। কিন্তু যে নিজেকে ভগবানের শরণে সমর্পিত করেছে, যার একমাত্র চিন্তা কীভাবে পরমেশ্বরের শুদ্ধ ভক্ত হয়ে তাকে লাভ করা যায় তার কাছে সমস্ত সাধন-ভজনই প্রেমময় হয়ে উঠবে।]

১১। ঈশ্বরকে প্রধান লক্ষ্য করে কেবল সেই ব্যক্তি চলতে পারে, যে ত্রিকালাবাধিত সত্যকেই জানতে চায়।

[ঈশ্বরলাভ একমাত্র উচ্চাশা নয়, তা এক সর্বোচ্চ গন্তব্য যেখানে পৌঁছাতে শুধু আকাঙ্ক্ষা যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন হয় পরিশ্রম, ত্যাগ, অনুশীলন ও উপযুক্ততা। সবাই চায় ঈশ্বরকে পেতে, কিন্তু সেই চাওয়ার পরিপূর্ণতা তখনই সম্ভব, যখন তার সঙ্গে যুক্ত হয় সদ্গুণ, শুদ্ধাচার, বৈরাগ্য, নিয়মিত উপাসনা এবং আন্তরিক আত্মসংযম। যেমন কেউ মনে করলেই কোনো দূরবর্তী গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারে না, যদি না সে নিজে পায়ে হেঁটে, বা যথাযথ উপায়ে সেখানে পৌঁছবার চেষ্টা করে; তেমনি ঈশ্বরও কেবল ইচ্ছা করলেই লাভ হয় না।ঈশ্বরলাভের পথ কঠিন, কারণ তা চিত্তের পূর্ণ সংযম, কর্মের শুদ্ধতা, জ্ঞানের পরিপক্কতা ও আন্তরিক বিশ্বাসের দাবি রাখে। যাঁরা এই গুণাবলিতে নিজেকে দৃঢ় করেছেন, যাঁরা কেবল তত্ত্ব নয়, আচার ও সাধনার দ্বারা নিজেকে রূপান্তরিত করেছেন, তাঁরাই প্রকৃতার্থে পরমাত্মাকে লাভ করতে সক্ষম হন। অতএব, ঈশ্বরলাভের আকাঙ্ক্ষা যথার্থ তখনই হয়, যখন তা ক্রিয়া ও সাধনার দ্বারা বাস্তবের পথে রূপান্তরিত হয়।]

ভক্তের উন্নতি

১। সহনশীল, সত্যগ্রাহী, জিজ্ঞাসু ব্যক্তি মাত্রই যোগপথে অগ্রসর হতে পারে।

২। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য মানুষকে তার প্রত্যেক বিশ্বাসকে পরতে পরতে খুলে খুলে দেখতে হয়, প্রমাণ দ্বারা তাদের বিচ্ছেদ করতে হয়, তবেই ভ্রান্ত বিশ্বাস দুর্বল হয় ও সঠিক বিশ্বাস দৃঢ় হয়।

৩। স্থূলবুদ্ধি থেকে সূক্ষ্মবুদ্ধিতে; আচরণগত ন্যূনতা থেকে উৎকৃষ্ট আচরণে; জ্ঞান, কর্ম, উপাসনায় গতিশীল হওয়াতে মানুষ মহান হয়।

[মানুষের মহত্ত্ব জন্মগত নয়, তা গঠিত হয় ধাপে ধাপে আত্মোন্নতির সাধনায়। এই উন্নতির পথ শুরু হয় **স্থূলবুদ্ধি থেকে সূক্ষ্মবুদ্ধিতে উত্তরণ** দিয়ে, যেখানে ব্যক্তি কেবল বাহ্যজগৎ নয়, অন্তর্জগৎ সম্পর্কেও চিন্তা করতে শেখে। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন **আচরণগত উৎকর্ষতা** অর্থাৎ ন্যূনতা, স্বার্থপরতা, লোভ, হিংসা প্রভৃতি ত্যাগ করে উচ্চতর নৈতিকতা ও দয়া, সত্য, সংযমের দিকে এগিয়ে যাওয়া। এই মনঃসংস্কার তখন পূর্ণতা পায় যখন ব্যক্তি **জ্ঞান, কর্ম ও উপাসনা**—এই ত্রিপথে নিজেকে গতিশীল রাখে। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এই তিনই মানুষের পরিশুদ্ধির পথ 'বিজ্ঞান'-এর পথ। এই ধারাবাহিক উত্তরণেই মানুষ কেবল সমাজে নয়, আত্মার জগতে **মহানত্বের** আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়।]

৪। যে মানুষ সব সময় মৃত্যুর দিকে লক্ষ্য রাখে সে দ্রুত চিন্তা করে, দ্রুত কাজ করে। ফলে লক্ষ্যের দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়।

৫। মনে কামাদি বিকার না আসার এক উপায় হলো নিজেকে সদা উত্তম কাজে ব্যস্ত রাখা। মহান লক্ষ্য স্থির করে তার পূরণে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

[মানবচেতনায় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি অন্তর্জ বিকার স্বাভাবিকভাবেই উদিত হয়, বিশেষত যখন মন নিষ্কর্ম, শূন্য ও উদ্দিষ্টহীন থাকে। নিত্য কর্তব্যকর্মে রত থাকা উচিত। কারণ, **অলসতা ও উদ্দেশ্যহীনতা বিকারদের প্রবেশদ্বার**। এইজন্য মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী উপদেশ প্রদান করেছেন, কামাদি বিকার থেকে আত্মাকে রক্ষা করার এক কার্যকর উপায় হলো **নিজেকে সদা উত্তম কর্মে নিয়োজিত রাখা**, যেখানে মন, বাক্য ও দেহ ত্রয়ীই সদাচরণে ব্যস্ত থাকে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় **মহৎ লক্ষ্যের নির্ধারণ**, যা আত্মাকে উচ্চস্তরে উদ্বুদ্ধ

করে। যে ব্যক্তি নিজের জীবনের লক্ষ্যকে কল্যাণময়, বিশুদ্ধ ও ধর্মসংগত করে তোলে এবং তার পূরণে সদা সচেষ্ট থাকে, তার অন্তরে কদাচ উদয় হয় না অবাঞ্ছিত ভাব। বরং সেই সাধনাই তাকে ঈশ্বরোপাসনার যোগ্য ও আত্মশুদ্ধির উপযুক্ত করে তোলে।]

৬। ব্যক্তি সারাদিন গঠিত-বিকৃত হতে থাকে। ভ্রান্ত জ্ঞান, কর্ম, উপাসনায় বিকৃত হয় এবং সঠিক জ্ঞান, কর্ম, উপাসনায় সংশোধিত হয়। সাধক এটা সব সময় মনে রাখে, নিজে সচেতন থাকে ও নিজেকে সংশোধন করে। এই প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন চললে এতে নিজের মধ্যে দৃঢ়তা আসে।

[অর্থাৎ, অভ্যাসের মাধ্যমে অধর্ম ত্যাগ সহজ হয়। এভাবে অধর্ম ত্যাগের স্বভাব নিজের মধ্যে গড়ে তুললে পরবর্তীতে ভুল কোনো বিশ্বাস গড়ে উঠে না বা ভুল পদক্ষেপ নেওয়া হয় না।]

৭। জীবনের সাফল্য লাভের জন্য অতিসতর্কভাবে চলতে হয়। যেমন- আমি কী দেখব, কী না দেখব, কী শুনব, কী না শুনব, কী জানব, কী না জানব, কী করব, কী না করব।

৮। জগতে নানারকম অদ্ভুত ঘটনা ঘটে, কিন্তু যোগাভ্যাসী সদা লক্ষ্য রাখে, এসবের আমার উপর কী প্রভাব হচ্ছে, আমার মোক্ষলক্ষ্য শিথিল হচ্ছে কি না? যদি সেগুলোর কুপ্রভাব পড়েও তবু সে দ্রুত তা দূর করে।

৯। নিজে ব্রহ্মবেত্তা না হওয়া পর্যন্ত গুরুর নির্দেশনায় থাকুন, গুরুর শিক্ষা অনুযায়ী চলুন, তবেই কল্যাণ সম্ভব, না হলে পতন।

[উল্লেখ্য, শিক্ষক ব্যতীত কেউ শিক্ষিত হয় না। হোক তা পূর্বজন্মের সংস্কার কিংবা ইহজন্মের শিক্ষা। তবে গুরু তাঁকেই বলা হবে যিনি কিনা বৈদিক শাস্ত্রের অনুকূল শিক্ষাই দেবেন।]

১০। নবীন সাধক ভাবে, 'সংসারের দুঃখমিশ্রিত সুখ ত্যাগ করলে আমার হাতে কী থাকবে? একদিকে সংসার-সুখ ত্যাগ করলাম, অপরদিকে এখনো ঈশ্বরসুখ শুরু হয়নি, তবে আমার কি কিছুই থাকবে না? আমি তো শূন্য হয়ে যাব''। তখন তার ভাবা উচিত, সংসার-সুখ ত্যাগ করতেই তৃষ্ণাক্ষয়জনিত সন্তোষসুখ লাভ হয়, যা সংসারের সর্বোচ্চ সুখ থেকেও শ্রেষ্ঠ।

[সংসারে বিদ্যমান জড়জাগতিক সুখ মায়াবদ্ধ অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের ভালোই মনে হয়। ফলে যখন সে ঈশ্বরের সাধনার দিকে এগিয়ে যায় বা ভক্ত হতে চেষ্টা করে তখন তার মনে হয় যে ঈশ্বর পাবো কবে জানি না, এখন যে সুখ পেতাম সেটাও হারাচ্ছি। তখন তাকে ভাবতে হবে, যে বস্তু পেলে আমি সুখী হতাম সেই বস্তু তো ক্ষণস্থায়ী। বস্তু বা বিষয় যদি শেষ হয়ে যায়, হারিয়ে যায় তবে কি তার থেকে আর আনন্দ পাবো? যদি না পাই অযথা সেই মোহে না আটকে ভগবৎসাধনা করলে ইহলোকেও কল্যাণ ও পরলোকেও শান্তি।]

১১। নতুন সাধক শুরুতে সমাজসেবা কম করুক, কিন্তু করতে হবেই। বাদ যেন না যায়। তার মনে সব সময় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা থাকা উচিত যে, আমি যোগ্য হয়ে এই সমাজের উপকার করব। যথাসম্ভব নিষ্কামভাবে পরোপকার করা আবশ্যক।

[যে নতুন নতুন সাধনা শুরু করে তাকে অনেক নিয়মনীতি মেনে চলতে হয়। তখন দেখা যায় বাহ্যজগতের সাথে যোগাযোগ কমে যায়। কেননা নিজেকে শক্তিশালী না করে তামসিক জগতে সত্য প্রচার করতে পারা যায় না। নিজের মধ্যে বিকৃতি আসার বা বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাহলে কি সেই শিক্ষানবিশ সাধক সমাজসেবা করবেই না? অবশ্যই করবে। কেননা মানবিকতাও সাধকেরই গুণ। মানবসেবা না করলে ধর্মপথে সে এগোবে কীভাবে?]

১২। জগতের উপকার না করে কেউ যোগী হতে পারে না। যেমন ঈশ্বর আমাদের সত্যজ্ঞান অর্থাৎ বেদ প্রদান করেন, তেমন আমাদেরও অন্যকে দেওয়া উচিত এবং সত্যজ্ঞানের রক্ষা করা উচিত।

১৩। দায়িত্ব ভুলে যাওয়া, দেরিতে করা, ভালোভাবে না করা, অবহেলা করা, ভুল হলেও তা গুরুত্ব হিসেবে না নেওয়া এসব কিছুই দায়িত্বহীনতার মধ্যে পড়ে।

১৪। যে ব্যক্তি দায়িত্বকে অতি নিষ্ঠাপূর্ণভাবে ও ভালোভাবে পালন করে, শ্রদ্ধালু হয়ে কাজ করে সে জাগতিক দৃষ্টিতে যেমন সাফল্য ও উন্নতি পায়, তেমনি যোগমার্গেও ভালো অগ্রগতি করে।

১৫। যেমন ব্যক্তি নিজ উন্নতি সব সময় কামনা করে, বিকল্প চিন্তা করে না, কখনোই নিজ পতন কামনা করে না তেমন অন্যের জন্যও এমন চিন্তা করা ঈশ্বরপ্রাপ্তিতে অত্যন্ত সহায়ক।

[যেমন কোনো ব্যক্তি নিজের উন্নতি, মঙ্গল ও শুদ্ধিকরণ সর্বদা কামনা করে এবং কখনোই নিজের পতন বা অনিষ্টের চিন্তা করে না, তেমনি অন্যজনের জন্যও একই শুভকামনা ও ইতিবাচক ভাবনা রাখা ধর্ম ও ঈশ্বরপ্রাপ্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আদর্শ বন্ধু তিনিই পরস্পরের কল্যাণ কামনা করেন। যখন আমরা নিজেকেই যেমন উন্নতির পথে চালিত করি, একই ভাবনা ও শুভেচ্ছা অন্যের জন্যও রাখি, তখন আমাদের হৃদয়ে **মমত্ব ও করুণা জন্মায়**, যা ঈশ্বরভক্তির মূলমন্ত্র। এমন নৈতিক ও মানসিক অবস্থা আমাদের আত্মাকে পরম সত্যের সান্নিধ্যে পৌঁছে দেয়, কারণ ঈশ্বরও সকলের কল্যাণ কামনাকারী। তাই নিজ ও পরের উন্নতির প্রতি নিষ্ঠাবান মনোভাবই সত্যিকারের **ভক্তি ও মোক্ষের দ্বারপ্রহরী**।]

১৬। যোগাভ্যাসীর জাগতিক ব্যবহারও উত্তম হওয়া প্রয়োজন।

[অর্থাৎ, যোগী অপরের সাথে আচার-ব্যবহার সুন্দরভাবে করবে।]

১৭। যোগাভ্যাসে যে যে লাভ হয়েছে তা চিন্তা করা উচিত, মনে রাখা উচিত। এসব হতাশার সময়ে আশার সঞ্চার করে।

[যোগের সাধনায় অর্জিত প্রতিটি লাভ, হোক সে মানসিক শান্তি, আত্মসংযম, মনোবল বৃদ্ধি কিংবা ঈশ্বরসাধনার অনুভূতি এসবকে নিয়মিত **চিন্তা ও স্মরণ** করা প্রয়োজন। কারণ জীবনের কঠিন ও হতাশাজনক মুহূর্তগুলোতে এই স্মৃতিগুলো আমাদের **আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে**। স্মৃতি থেকে পাওয়া যায় সুখ ও শক্তি। যখন মন অবসন্ন বা হতাশ হয়, তখন অতীতের যোগচর্চায় প্রাপ্ত সুফলগুলো মনে করে নিজেকে উৎসাহিত করতে হবে। এতে মনোসংযোগ ফিরে আসে, হৃদয়ে নতুন উদ্যম জাগে, এবং পুনরায় সাধনার পথে দৃঢ়পদক্ষেপ করা সম্ভব হয়। অতএব, যোগাভ্যাসের সৌন্দর্য ও মহিমা উপলব্ধি করে তার স্মৃতিকে জীবনের প্রেরণার উৎস হিসেবে ধারণ করাই প্রকৃত ধ্যানকারীর শিক্ষা।]

১৮। যে ব্যক্তি পূর্বে প্রস্তুতি নিয়েও একবারও মন থেকে পার্থিব সম্পর্ক মুছে ফেলেনি, সে ভবিষ্যতেও তা সহজে মুছতে পারবে না। অতএব, একবার সম্পূর্ণ পরিশ্রম করে তা মুছে ফেলুন। পুনরায় উদয় হলে পূর্বের সেই প্রস্তুতি ব্যবহার করুন। এভাবে করতে করতে অবস্থাটি দৃঢ় হবে ও তা মুছে ফেলা সহজ হবে। অবশেষে তা জয়ও হবে।

[অভ্যাসের মাধ্যমেই বৈরাগ্য অর্জিত হয়। যদি আমি পূর্বে প্রস্তুতি নিয়েও জাগতিক মোহ একবারের জন্যেও ত্যাগ করতে না পারি তবে ভবিষ্যতেও সেই সম্ভাবনা কম। তবে যদি এমন হয় আমি চেষ্টা করছি বারংবার তবে

পূর্বের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হবে। আস্তে আস্তে নিজেকে দৃঢ় করতে হবে। এভাবে এমন এক সময় আসবে যখন আর বিচলিত হব না।]

১৯। কোনো গুণ অর্জনে বা কোনো দোষ পরিত্যাগে একজন মানুষ যতবারই ব্যর্থ হোক না কেন, গুণ অর্জন ও দোষ বর্জনের জন্য সে যেন চেষ্টা চালিয়ে যাক, কখনো নিরাশ যেন না হয়। নিরাশ না হয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়াতেই সফলতা নিশ্চিত।

বিবেক-বৈরাগ্য

১। বৈরাগ্য যদি না থাকে, তবে চিত্তবৃত্তির নিরোধ সম্ভব নয়।

[বৈরাগ্যই চিত্তের শুদ্ধির প্রধান মাধ্যম। বৈরাগ্য ছাড়া চিত্তের স্থিতিশীলতা অর্জন অসম্ভব, আর চিত্তস্থিরতার মাধ্যমেই সত্যজ্ঞান ও মুক্তির পথ সুগম হয়। তাই সকল ভাবমূর্তির ঊর্ধ্বে উঠে বৈরাগ্য অর্জন করাই আসল ধ্যান ও মুক্তির মূলমন্ত্র।]

২। প্রতিকূল অবস্থায় রুষ্ট বা ক্লান্ত হয়ে পড়া, বিবেক ও বৈরাগ্যলাভে বাধা।

৩। ব্যঙ্গাত্মক কিংবা উপহাসযোগ্য ভাষায় কথা বলা, বিবেক-বৈরাগ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

[অকারণে ব্যঙ্গাত্মক বা উপহাসমূলক ভাষায় কথা বলা মানে শুধুমাত্র অন্যকে আহত করাই নয়, বরং তা নিজের অন্তরের **বিবেক** ও **বৈরাগ্য** (আত্মসংযম ও মমত্ববর্জনের) জন্যও ক্ষতিকর। কারণ শাস্ত্রশাস্ত্রে স্পষ্ট নির্দেশ আছে যে, সদ্বুদ্ধি ও করুণা ছাড়া উচ্চারিত শব্দ ও মনোভাব মনকে বিষাক্ত করে। অযৌক্তিক ব্যঙ্গ ও উপহাসের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় অহংকার, হিংসা, ও বিদ্বেষ যা আত্মার

বিশুদ্ধতার পথে বড় প্রতিবন্ধকতা। একজন সাধকের মন সর্বদা **সহিষ্ণু, নম্র ও ধীর** থাকে; কারণ এভাবেই বিবেক শক্তিশালী হয় এবং বৈরাগ্যের প্রকৃত বিকাশ ঘটে। তাই ভাষায় ও আচরণে সতর্ক থাকা, বিনয়ের সঙ্গে কথা বলা এইই হলো প্রকৃত ধ্যান ও আত্মশুদ্ধির লক্ষণ।]

৪। সাধক যখন গম্ভীর চিন্তনে নিমগ্ন থাকে, তখন সে বিবেক বৈরাগ্যের দিকে অগ্রসর হয়। হাস্যপ্রবণতায় সেই গম্ভীর চিন্তা শেষ হয়ে যায়, ফলে বিবেক-বৈরাগ্যের অবস্থা লঘু বা লুপ্ত হয়ে পড়ে।

জ্ঞান–অজ্ঞান

১। সৎ বা অসৎ কর্মের পেছনে আমাদের জ্ঞানই কাজ করে; কর্মে প্রবৃত্ত করে জ্ঞান। জ্ঞানে ত্রুটি ঘটলেই কর্ম ও উপাসনায় ত্রুটি ঘটবে। শুধু তাই নয়, জ্ঞানে ত্রুটি ঘটলে পরবর্তী জ্ঞান অর্জনেও বিভ্রান্তি আসবে।

২। বৈরাগ্য লাভ না হওয়ার মূল কারণ 'জ্ঞানভ্রান্তি'' । জ্ঞানে ত্রুটি থাকলে অগ্রগতি থেমে যাবে, বুদ্ধির বিকাশ হবে না।

৩। চিন্তায় ত্রুটি থাকলে, ব্যক্তি সুখে বাঁচতে চাইলেও সুখে বাঁচতে পারে না।

৪। নিজ অভিজ্ঞতা ও অনুমান থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানকে ঋষিদের জ্ঞানের সঙ্গে সদা তুলনা করে দেখা উচিত।

[মানবজীবনে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুমানের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান মূল্যবান হলেও তা সর্বদা **ঋষিদের চিরন্তন ও প্রামাণিক জ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করা প্রয়োজন।** কারণ ঋষিরা দীর্ঘতর তপস্যা, ধ্যান ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সত্য উপলব্ধি করেছেন, যা বর্ণিত আছে শাস্ত্র ও উপনিষদে। নিজের জ্ঞানকে ঋষিজ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন রাখলে সহজেই মনের বিভ্রান্তি ও ভুল বোঝাবুঝি

জন্মায়। তাই একদম নতুন বা প্রাথমিক ধারণাগুলোকে প্রাচীন ও সর্বজনগ্রাহ্য প্রমাণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে গৃহীত বা পরিত্যাগ করা উচিত। এভাবেই জ্ঞানের নিখুঁত বিশুদ্ধি ও বৃদ্ধি সম্ভব হয়।]

৫। যেখানে নিজের অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান কার্যকর হচ্ছে না, অবস্থান দ্বিধাগ্রস্ত, তখন যোগাভ্যাসী শব্দপ্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজের অবস্থান সংহত রাখতে পারে।

[শব্দপ্রমাণ মানে বেদ এবং ঋষি-মুনি-আচার্য-গুরুর বেদানুকূল উপদেশ]

৬। সত্যজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত হলেও, যদি তার সুরক্ষা না করা হয়, তবে পরবর্তীতে কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে তাতে সংশয় বা মিথ্যা জ্ঞানও আসতে পারে।

৭। অজ্ঞান ও অজ্ঞানের উৎপাদক সংস্কারগুলো সম্পূর্ণরূপে নাশ হলে ব্যক্তি পূর্ণ শান্তি ও আনন্দের আস্বাদ পায়।

৮। যদি আমাদের বুদ্ধিতে সারাদিন ধরে পরমেশ্বরের সঙ্গে আত্মা ও অন্যান্য পদার্থের সর্বব্যাপী ও ব্যাপ্ত অনুভব স্থিত না থাকে, তবে এটাই স্পষ্ট হয় যে, অজ্ঞান আমাদের মধ্যে এখনো রয়ে গিয়েছে। অজ্ঞানের ফল ভোগ করতেই হয়।

[যদি আমাদের বুদ্ধি ও মন সারাদিন ধরে পরমেশ্বরের সঙ্গে, তাঁর আত্মা ও সমস্ত সৃষ্টির সর্বব্যাপী উপস্থিতি ও ব্যাপ্তি অনুভব করতে অক্ষম থাকে, তবে তা নির্দেশ করে যে আমরা এখনও **অজ্ঞানতার আবরণের মধ্যে আবদ্ধ।**

অজ্ঞানের কারণে আমরা নিজের প্রকৃত স্বরূপ ও ঈশ্বরের মহত্ব বুঝতে পারি না, ফলে দুঃখ, মোহ ও সংশয়ে আবদ্ধ থাকি। শাস্ত্র স্পষ্ট করে যে, **অজ্ঞান থেকেই জন্ম নেয় সকল দুঃখ ও ভ্রান্তি।** এই অজ্ঞানের ফল হিসেবে আমাদের দুঃখ ভোগ করতে হয়; মোক্ষের পথে অগ্রসর হতে পারি না। তাই মন ও

বুদ্ধিকে নিবিষ্ট করে পরমেশ্বরের ভাবনায় স্থির রাখা অর্থাৎ ঈশ্বরস্মরণ ও ধ্যান অজ্ঞানতা দূর করার একমাত্র পথ।]

সম্যক দৃষ্টি

১। ভবিষ্যতে যতই সাফল্য আসুক, বর্তমানের লক্ষ্য হ্রাস করা আলস্যের পরিচায়ক।

[ভবিষ্যতে যতই সাফল্য আসার সম্ভাবনা থাকুক, যদি বর্তমান মুহূর্তে আমাদের লক্ষ্য স্থির না থাকে বা কমে আসে, তবে তা স্পষ্টতই **আলস্য ও মনোবলের অভাবের পরিচায়ক।** কারণ প্রকৃত সাধক জানে ভবিষ্যতের সাফল্যের ভিত্তি হলো আজকের নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম ও সংকল্প।
সদা কর্তব্যপরায়ণ থাকা ছাড়া কোনো বিকাশ সম্ভব নয়। বর্তমানের লক্ষ্য থেকে মন বিচ্যুত হলে সাফল্য দূরের কথা, সাধনার পথও কেটে যায়।
সুতরাং, সফলতার যাত্রায় স্থির মনোযোগ ও সততা বজায় রাখা অত্যাবশ্যক; তা না হলে **আলস্য ও অবসন্নতা চূড়ান্ত পরাজয়ের কারণ।]**
২। আমাদের কর্তব্য সাধারণ লোকদের সঙ্গে আপস করা নয়, বরং ঋষিদের সঙ্গে সমন্বয় করা।
৩। আমরা কী ভাবি, জগৎ কী বলবে না এটা বিষয় না। ঈশ্বরের মানদণ্ডে তা কেমন এটাই ভাববার বিষয়। জগৎ যে কাজকে সঠিক বলে, তা যদি ঈশ্বরের বিধানে ভুল হয়, তবে তার স্বীকৃতিতে লাভ কী?
৪। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের বিধান অনুযায়ী খারাপ, সে খারাপই। আর যে উত্তম, সে উত্তমই। ভালো-মন্দ বিচারে সমাজই চূড়ান্ত মানদণ্ড নয়।

[২-৪।আমাদের কর্তব্য কখনোই সাধারণ জনসাধারণের আপস বা অনৈতিকতা মেনে নেয়া হতে পারে না। বরং সত্যপথের অনুসরণে আমাদের উচিত **ঋষিদের উচ্চতর জ্ঞানের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা**, কারণ তাঁরা ঈশ্বরের অনুকূল নির্দেশনা নিয়ে মানবজাতিকে পথ দেখিয়েছেন। আমরা যেটা ভাবি বা জগৎ যেটাকে সঠিক বলে, তা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সঠিক কিনা-এইটাই প্রকৃত মূল্যায়নের বিষয়। কারণ **ঈশ্বরের বিধানই চিরন্তন সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ড,** আর জগৎ কখনো ভুলমত দিয়ে বিভ্রান্ত হতে পারে। গীতা (৪.৩৮) বলে 'নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে' অর্থাৎ, জ্ঞানের মতো পবিত্র কিছু এই জগতের মধ্যে নেই। তাই **ঈশ্বরের আদর্শ ও বিধানের বিপরীতে জগতের কোনো ভ্রান্ত স্বীকৃতির কোনো মূল্যই নেই**। সত্য ও ধর্মের পথে চলার জন্য ঈশ্বরের মানদণ্ডকেই সর্বোচ্চ মাপকাঠি ধরা উচিত।]

৫। যেমন সাধারণ মানুষ দুঃখকে ঘৃণা ও অপছন্দ করে, তেমনই যোগী পঞ্চেন্দ্রিয়ভোগকে ঘৃণিত ও অপছন্দনীয় মনে করেন। তিনি এগুলোকে দুঃখদায়ক জেনে অর্জন করতে চান না।

৬। সাধারণ মানুষ ভাবে, "আমি যোগপথে চলতে চাই, কিন্তু আমার সামর্থ্য নেই।" এটি পালিয়ে যাওয়ার মানসিকতা। সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তি অল্প সামর্থ্য থাকলেও সেই পথে এগোয়, নিজের সামর্থ্য বাড়ায় ও উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহ করে।

৭। যোগাভ্যাসী ব্যক্তি অন্যদেরও বিচার করে, তাদের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে, গুণ গ্রহণ করে—কিন্তু দোষ দেখে বিদ্বেষ করে না।

[যোগী অন্যের থেকে ভালো গুণ গ্রহণ করে। দোষ গ্রহণ করে না। কিন্তু কারো দোষ আছে বলে তাকে ঘৃণাও করে না। বরং সেই ব্যক্তিও যেন ভালোর পথে এগিয়ে যায় তাতে সাহায্য করে।]

৮। কারো কিছু গুণ দেখে তার দোষকে গুণ মনে করা অনুচিত, আবার কারো কিছু দোষ দেখে তার গুণকে দোষ ভাবাও অনুচিত। যে ব্যক্তি গুণ ও দোষের পৃথক বিচার করে না, সে জীবনে ব্যর্থ হয়।

৯। অন্যের কাছে কিছু প্রত্যাশা করার আগে তার সামর্থ্য ও উপকরণও বিবেচনায় রাখা উচিত।

১০। যোগাভ্যাসকে কষ্ট না ভেবে কর্তব্য হিসেবে ভাবলে তবেই সাফল্য আসে।

১১। ঈশ্বরের ন্যায়ব্যবস্থাকে ভয় করে সৎ পথে চলা উচিত; তবে ভয় ছাড়াও ঈশ্বরকে সাক্ষী জেনে সৎ পথে চলা সম্ভব এবং এটাই উৎকৃষ্টতর অবস্থান।

[নৈতিক আচরণের প্রেরণা অনেক সময় ঈশ্বরের ন্যায়ব্যবস্থার প্রতি ভয় থেকে আসে। মানুষ জানে, যে কুকর্ম করে, সে ঈশ্বরচক্ষে অপরাধী; ফলত, দণ্ড অনিবার্য। এই ভয় মানুষকে অধর্ম থেকে বিরত রাখে। তবে ধর্মজিজ্ঞাসুর জন্য এর চেয়েও উন্নত স্তর আছে সেটি হলো ঈশ্বরকে সদাসর্বত্র সাক্ষী রূপে অনুভব করা। যখন কেউ ভয় নয়, বরং ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা ও সান্নিধ্য অনুভব করে সৎকর্মে অটল থাকে, তখন তা হয় পরিপক্ক ধর্মবোধের পরিচায়ক। এই অবস্থায় ব্যক্তি তার অন্তরে সদা এক সাক্ষীর উপস্থিতি অনুভব করে, যে দর্শন করে তার প্রতিটি চিন্তা, বাক্য ও কর্ম। এই উপলব্ধি থেকেই প্রকৃত ধর্মাচরণের উদ্ভব হয় যেখানে ভয় নয়, বরং প্রেম, শ্রদ্ধা ও আত্মদায়িত্ব মানুষকে সত্যপথে পরিচালিত করে।]

১২। মানুষ অনেক সময় কোনো ঘটনাকে অভূতপূর্ব মনে করে অতিরিক্তভাবে প্রভাবিত হয়। বাস্তবে কোনো ঘটনাই নতুন নয়।

[মানুষ প্রায়শই কোনো বিশেষ ঘটনা দেখে সেটিকে অভূতপূর্ব, বিরল বা অদ্ভুত মনে করে অতিরিক্ত প্রভাবিত হয়। কিন্তু গভীর অন্তর্দৃষ্টি থেকে দেখা গেলে বোঝা যায় **প্রকৃতপক্ষে কোনো ঘটনা সম্পূর্ণ নতুন নয়।** জীবনের সমস্ত

পরিণতি, অভিজ্ঞতা ও পরিস্থিতি পূর্বপুরুষদের জীবনচক্রের পুনরাবৃত্তি মাত্র। শাস্ত্র ও ইতিহাস আমাদের শেখায় যে, **সবই একটি নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতায় ঘটে**, যেখানে নতুন বলে কিছু নেই শুধু প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন। এই উপলব্ধি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তৃত করে, মনের স্থিরতা বৃদ্ধি করে এবং অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত উত্তেজনা থেকে মুক্তি দেয়। সুতরাং, জীবনের ঘটনাগুলোকে কেবল প্রভাবিত হয়ে গ্রহণ না করে, তাঁদের গভীর অর্থ ও প্রেক্ষাপট বুঝে নেওয়াই প্রকৃত ধ্যান ও জ্ঞান।]

১৩। প্রমাণ ব্যতীত কোনো ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে মিথ্যা ধারণা গঠন করা মানসিক পাপ। যতক্ষণ না প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, ততক্ষণ বিশ্বাস করা উচিত নয়। না মানলে খুব একটা ক্ষতি নেই, কিন্তু বিনা প্রমাণে বিশ্বাস করলে তার ফল হবে—সেই ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ, উপহাস, অবজ্ঞা, তুচ্ছতা প্রভৃতি মানসিক প্রবণতা সৃষ্টি হবে, যা আত্মিক অগ্রগতিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে।

১৪। যদি কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ ওঠে, তবে তার প্রতিবাদ এ কারণে করা উচিত নয় যে এতে নিজের অসম্মান হচ্ছে, বরং এজন্য করা উচিত যে প্রতিবাদ না করলে ওই মিথ্যার পৃষ্ঠপোষকতা করা হবে।

কিছু তথ্য

১। বিশুদ্ধ জ্ঞান, বিশুদ্ধ কর্ম ও বিশুদ্ধ উপাসনার মাধ্যমেই ব্যক্তি যোগী হয়ে ঈশ্বর লাভ করতে পারে, অন্যভাবে নয়।

২। পার্থিব সুখ কোটি কোটি মানুষ পায়, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা তো কেবল কিছু মানুষই পায়।

৩। প্রাথমিক যোগ-অনুশীলনকারীরা প্রায়শই মনে করে ঈশ্বরলাভে সুখ ও সাফল্য আছে, আবার পার্থিব উপকরণেও সুখ ও সাফল্য আছে — উভয়কে একসাথে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এটা সম্ভব নয়।

৪। যিনি শ্রেয় পথে পরিশ্রম করেন, তিনিই প্রেয়পথ থেকে বাঁচতে পারেন; অন্যেরা নয়। শ্রেয়পথে পরিশ্রমে শিথিলতা এলেই ব্যক্তি প্রেয়পথে এগিয়ে যাবে।

৫। যে সাধক তীব্র পরিশ্রম, তপস্যা ও অনুশাসনে অভ্যস্ত নয়, যে ভৌতিকতাবাদের ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করতে জানে না, সে সমাজে গিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই যোগ ত্যাগ করে ভোগী হয়ে পড়বে।

৬। যারা বলে "আমরা মোক্ষ চাই না", তাদের এই কথা যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ মোক্ষ অর্থাৎ সম্পূর্ণ দুঃখ থেকে মুক্তি তো সকলেই চায়।

৭। ব্রহ্মলাভের লক্ষ্যবিশিষ্ট ব্যক্তি যে রকম নিষ্কাম কর্ম করতে পারবে, সেই রকম নিষ্কাম কর্ম এই লক্ষ্যহীন কেউ করতে পারবে না।

৮। হাজার হাজার বাক্সর্বস্ব পণ্ডিতের তুলনায় একজন ব্রহ্মবিদ্বান দ্বারা জগতের উপকার অনেক বেশি হয়।

[হাজার হাজার অকর্মণ্য পণ্ডিত থাকলেও তাঁদের চেয়ে একজন **ব্রহ্মবিদ্** অর্থাৎ, পরম সত্য ও ঈশ্বরের গভীর জ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তি জগতের জন্য সবচেয়ে অধিক উপকারী। কারণ এই ব্যক্তি শুধু পাণ্ডিত্য অর্জন করে শাস্ত্রবাণী বোঝে না বরং নিজে সেই জ্ঞানকে জীবনে প্রয়োগ করে সত্যিকারের মুক্তি ও কল্যাণের পথ প্রদর্শন করে। সত্য সাধকদের কর্মযোগেই বিশ্বে শুদ্ধি ও উন্নতি ঘটে। উদাহরণ হিসেবে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রমুখকে আমরা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। একজন ব্রহ্মবিদ্বানের চিন্তা ও কাজ সমাজকে আলোকিত করে, মানুষকে ভুলাচ্ছন্নতার বন্ধন থেকে মুক্ত করে এবং

সঠিক ধর্মপথে পরিচালিত করে। অতএব, সংখ্যার সঙ্গে গুণগত মান এবং অন্তরের গভীর জ্ঞানও দরকার এবং তা-ই প্রকৃত সেবা ও উন্নতির মাপকাঠি।]

৯। যেটা ক্ষতিকর ও দুঃখজনক বলে মনে হয় সেটাকে দূর করার প্রচেষ্টা কখনও থেমে থাকে না, মানুষ চেষ্টা চালিয়েই যায়। যদি চেষ্টা না করে, তবে স্পষ্ট যে সে সেটাকে ক্ষতিকর ও দুঃখজনক মনে করে না।

১০। জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে সংঘটিত অধর্ম, তড়িঘড়ি ও অসতর্কতায় সংঘটিত অধর্ম, এবং জেনেশুনে ইচ্ছা ও প্রচেষ্টায় সংঘটিত অধর্ম — এই তিনটি ক্রমান্বয়ে অধিকতর অবনতির অবস্থান।

[অর্থাৎ যে জ্ঞান কম তাই অধর্ম করেছে তার তুলনায় যে দ্রুত কোনো কাজ করতে গিয়ে অসতর্কতার জন্য অধর্ম করেছে সে বেশি দোষী। কেননা শাস্ত্র বলে ধীর-স্থির হয়ে কাজ করতে। তাদের থেকেও বেশি দোষী সেই ব্যক্তি যে কিনা ধর্ম কী তা জানে এবং জানার পরেও স্বজ্ঞানে অধর্মাচরণ করে]

১১। ভালো কাজ করলে মন্দ কথাগুলো চাপা পড়ে যায় বা ঢাকা পড়ে থাকে। ভালো কাজ বন্ধ করলেই মন্দ কথাগুলো আমাদের আক্রমণ করে। যেমন শ্রম করলে অলসতা থাকে না, শ্রম বন্ধ করলেই অলসতা আসে। এটাই নিয়ম।

১২। যে মৃত্যু হাতে নিয়ে চলে, সেই ব্যক্তি সর্বজনীন মহান ব্রতগুলো পালন করতে পারে। এর জন্য চাই মহাজ্ঞান, বল ও বৈরাগ্য।

১৩। ঈশ্বর সকলেরই সাধারণ সহায়তা করেন, সে কেউ তার নিয়ম মানুক বা না-মানুক; তবে ধর্মাচরণকারীকে তিনি নিয়মানুসারে বিশেষ সহায়তা, প্রেম, উৎসাহ দেন।

[ঈশ্বরকে যে অনুধাবন করতে চায় সে নিজের কর্মফল হিসেবেই ঈশ্বরে বিদ্যমান তেজস্বী ভাব, বলশালী স্বভাব, সৎ ও পুণ্যময় চেতনা লাভ করে। এটি কোনো বিশেষ সুবিধা হিসেবে যে পাচ্ছে না বরং ঈশ্বরের অনুগ্রহেই নিজের

কর্মের ফলে নিজে লাভ করছে।]

১৪। ব্যক্তির নিজেরও শক্তি আছে, যা সে আচার্য, গুরু, সমাজ, গ্রন্থাদি সঠিকভাবে ব্যবহার করে বাড়াতে পারে এবং দ্রুত অগ্রগতি করতে পারে। ঈশ্বরের বিশেষ সহায়তা পাওয়া তো আরও বড় কথা।

১৫। ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ফলে যেমন সহায়তা পাওয়া যায়, তেমনি যেমন এক শিশু যোগ্য পিতা-মাতা পেলে সহায়তা পায়; ঈশ্বর-বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি তো ঠিক যেন এক পথভ্রষ্ট অনাথ শিশু।

১৬। যে ব্যক্তি জগত দ্বারা প্রভাবিত হয়, সে আত্মিক উন্নতিতে ঈশ্বরের সহায়তা পায় না।

[জগত অর্থাৎ জাগতিক কামনা-বাসনা]

১৭। সকাম শুভ কর্ম করেও ব্যক্তি মন্দ কর্ম থেকে পুরোপুরি বাঁচতে পারে না। মন্দ কর্ম থেকে সম্পূর্ণ মুক্তির উপায় একমাত্র নিষ্কাম মনোভাব ও আচরণ।

১৮। বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, প্রেম ছাড়া- না আচরণ হয়, না অগ্রগতি হয়।

১৯। ব্যক্তি নিজেই বহু সমস্যার সৃষ্টি করে ও তাতে নিজেই জড়িয়ে থাকে।

২০। রাগ-দ্বেষ থাকলে বুদ্ধি গভীরতায় পৌঁছাতে পারে না।

২১। যে ব্যক্তি তত্ত্বগত বিষয়গুলোকে বাস্তবে প্রয়োগ করে, সেই ব্যক্তি ঋষি ও বেদের কথা বুঝতে পারে।

২২। সমাজে সর্বোত্তম উপকার হলো, এটা দেখানো যে বেদে প্রদত্ত আদর্শ আমাদের জীবনেও বাস্তবায়ন হতে পারে। তা না হলে সমাজের পতন রোধ করা যাবে না।

২৩। ভোগকে মুখ্য মনে করলে ব্যক্তি পাপ-পুণ্যের সংজ্ঞা ভেঙে দেয় বা নিজের ইচ্ছামতো তা পাল্টে দেয়।

[যখন ব্যক্তি জীবনকে শুধু ভোগের কেন্দ্রবিন্দু করে ধারণা করে, তখন তার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বিকৃত হয়। সে পাপ ও পুণ্যের **শাস্ত্রীয় সংজ্ঞাকে** তুচ্ছভাবে দেখতে শুরু করে, নিজের **স্বার্থ ও ইচ্ছামতো এগুলোকে পরিবর্তন বা ভাঙ্গনের** পথ নেয়। মনুস্মৃতিতে (৮.১৫) স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে **'ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ'** অর্থাৎ ধর্ম নিজেই সেই নীতি ও নিয়ম যা মানুষের কল্যাণ রক্ষা করে। ভোগের অন্বেষায় এই নীতিমালা উপেক্ষা করলে সমাজে অসামাজিকতা, অধর্ম ও অবিচার প্রসারিত হয়। সুতরাং, শুধুমাত্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য পাপ-পুণ্যের ধারণাকে অনুধাবন বা মান্যতা না দেওয়া **মানুষকে পথভ্রষ্ট করে**, এবং এটি **ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই বিপর্যয়ের কারণ** হয়ে দাঁড়ায়।]

২৪। মহর্ষি দয়ানন্দ, কঠোপনিষদের রূপক আখ্যানের নচিকেতা প্রভৃতির আদর্শ থেকে তারা কখনও বিচ্যুত হয়নি আজও দেখা যায় না তারা বিচ্যুত হয়েছেন। তারা কারা ? যাদের মনে সত্যের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা আছে, যারা মৃত্যুকেও ছোট মনে করে তারাই এমন হতে পারে।

২৫। অন্য ব্যক্তি আমাদের দোষ তখনই বলবে, যখন সে আমাদের কাছে নির্ভয়ে থাকবে। যদি সে জানে, বললে আমি মেনে নেব না, রেগে যাব, বিদ্বেষ করব বা উল্টো কিছু দোষ তাকে বলে দেব, তবে সে কেনই বা বলবে?

[পরার্থ ও আত্মশুদ্ধির পথে অন্যের সমালোচনা শ্রবণ এক অপরিহার্য অনুশীলন। আমাদের দোষ বা ভুলকে কেউ আমাদের সামনে উন্মোচন করবে, এটি কেবল তখনই সম্ভব, যখন সে আমাদের কাছ থেকে ভয় পাবে না, না অপমানের, না প্রতিহিংসার, না রূঢ় প্রতিক্রিয়ার। যদি আমাদের চিত্ত এত সংকীর্ণ হয় যে আমরা সমালোচনার উত্তরে ক্রোধ বা প্রতিশোধের পথ ধরি, তবে কেউ আর আমাদের প্রকৃত অবস্থা বলবে না। আত্মানুসন্ধানের এক অংশ হলো অন্যদের কাছ থেকে বিনয়ের সঙ্গে নিজের ত্রুটির কথা শোনা। যে ব্যক্তি

ক্রটি বলার সুযোগ দেয় না, সে ক্রটি সংশোধনের পথও বন্ধ করে। সত্যপ্রেমী এবং মোক্ষকামী সাধকের কর্তব্য, কৃতজ্ঞচিত্তে সৎ সমালোচনাকে গ্রহণ করে তা নিজের আত্মউন্নয়নের সোপানরূপে বিবেচনা করা।]

২৬। যদি ঈশ্বরলাভের জন্য কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি বিদ্বেষ জাগে তবে সে ঈশ্বর থেকে দূরে চলে যাবে। যিনি ঈশ্বরলাভের জন্য যা কিছু বাধা তার সঙ্গে বিদ্বেষ করলেন, সেই বিদ্বেষের জন্য ঈশ্বরলাভ আর হবে না।

[অর্থাৎ ঈশ্বর লাভ করতে যে ব্যক্তি বা বস্তু বাধা দেয় সেগুলোকে ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু যদি সেগুলোকে আমি বিদ্বেষের চোখে দেখি তবে আমার সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি বা ভক্তি তৈরি হবে না। আমি ঈশ্বর লাভও করতে পারব না]

২৭। নিজের ঈশ্বরকে শ্রেষ্ঠ মনে করে অন্য মতাবলম্বীদের সঙ্গে বিদ্বেষ, ঘৃণা, হত্যা বা ক্ষতি করা অনুচিত। মানুষ একে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বলে ভাবে, কিন্তু এতে ঈশ্বর আমাদের অন্তঃস্থল আরও দূরে সরে যান।

[বরং উচিত তাদের সুদপদেশ প্রদান করে, সত্য-মিথ্যা চিনিয়ে প্রকৃত ঈশ্বর ভক্তির দিকে নিয়ে আসা। কেননা, **ঋষির্বিপ্রঃ পুরএতা জনানামৃভুর্ধীর উশনা কাব্যেন (সামবেদ ৬৭৯)** অর্থাৎ মন্ত্রদ্রষ্টা , মেধাবী ব্রহ্মজ্ঞ ও নেতৃত্বদানকারী মানব জগতের কল্যাণ কামনা করে]

২৮। ঈশ্বর, জীব এবং প্রকৃতি এই তিনটি পদার্থই অনাদি। কারণ এদের উৎপাদক কারণ নেই।

আত্ম-পর্যবেক্ষণ

১। অতি মন্দবুদ্ধি ছাড়া অন্য সকল মানুষ, যারা ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ পাঠ করেন তারা আত্ম-পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানতে পারেন যে তারা পুরোপুরি সত্যবাদী, সত্যমনা ও সত্য কার্যকারী কি না।

২। আত্ম-পর্যবেক্ষণ একজন মানুষকে জানিয়ে দেয় যেসব সংসারিক বিষয়ের কথা আমরা পড়ি, শুনি, বুঝি যে তা সবই দুঃখময়। সেই বিষয়ের প্রতি এখনও আমাদের মনে আসক্তি আছে এবং তারই জন্য আমরা কাজ করি।

৩। আর্ষগ্রন্থ যেই উদ্দেশ্যে লেখা তা পড়ে আমরা সেই উদ্দেশ্য কতটা পূরণ করতে পারছি? তার জন্য কতটা চেষ্টা করছি? এগুলো একজন মানুষের চিন্তা করা উচিত।

[যে গ্রন্থগুলি ঋষিদের দ্বারা প্রণীত যাদের অভিজ্ঞতা, সাধনা ও ঋত্বিক জ্ঞান থেকে নির্গত জ্যোতি আমাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন চিত্তকে আলোকিত করতে পারে তাঁদের উদ্দেশ্য একমাত্র ছিল মানবকল্যাণ। এই গ্রন্থগুলির মাধ্যমে মানুষ যেন সৎপথে চলে, জীবনের পরমার্থ উপলব্ধি করে এবং ঈশ্বরপ্রাপ্তির উপযোগী হয় এটাই তাদের রচনার লক্ষ্য। আমরা আজ সেই পবিত্র আর্ষগ্রন্থ পাঠ করি; কিন্তু পাঠের উদ্দেশ্য কি উপলব্ধ করি? আমাদের চিত্তে কি সত্যসাধনার আগ্রহ জাগে, আচরণে কি তার প্রতিফলন ঘটে? না কি আমরা কেবলমাত্র পঠন-পাঠনের বাহ্যিকতা নিয়ে সন্তুষ্ট? এই প্রশ্ন আমাদের প্রতিনিয়ত নিজেকে করতে হবে। আর্ষগ্রন্থের উদ্দেশ্য পূরণ করতে হলে কেবল অধ্যয়ন নয়, আত্মপরিশ্রম, আত্মসংযম ও অনুশীলনের প্রয়োজন। সৎ চিন্তা, সদ্ব্যবহার, ব্রত, উপাসনা ও সমাজকল্যাণমূলক কর্মের দ্বারা আমরা সেই গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারি। আর এভাবেই আর্ষগ্রন্থ পাঠ আমাদের আত্মোন্নয়ন ও পরমপ্রাপ্তির পাথেয়

হয়ে উঠতে পারে। চাইলে এই অনুচ্ছেদকে ঈশ্বরোপাসনা-কেন্দ্রিক, শাস্ত্রীয়, বা দর্শনভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে আরও গভীর করা যায়।]

৪। যত ব্যর্থতা, কষ্ট, অবনতি হয়, তার মূল কারণ ততখানি অজ্ঞানতা এবং যত সাফল্য, সুখ, উন্নতি হয়, তার মূল কারণ ততখানি জ্ঞান। পরীক্ষা করো "আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি?"। সত্যান্বেষী ব্যক্তি নিজের মধ্যে এই অজ্ঞানতাকে সহ্য করতে পারবে না।

৫। আত্ম-পর্যবেক্ষণ করো — "আমি কি সত্যের সাথে আপস করছি?"

৬। যোগ-অভ্যাসকারী আত্ম-পর্যবেক্ষণ করে যে, তার জীবনে কোনো আড়ম্বর আছে কি না, সে কি কেবল লোকদেখানো কিছু করছে কি না।

৭। আত্মিক অগ্রগতির অনুভব হলেও সাধকের ভাবা উচিত — "আমি কি ভুল বুঝছি না? আমি কি অগ্রগতির ভ্রান্ত ধারণায় নেই, যেখানে আসলে অগ্রগতি ঘটেনি ?"

দোষ

১। কারো কাছে জানতে চাওয়া হয় "আপনার মধ্যে কি রাগ-দ্বেষ-ক্রোধ আছে?" সে উত্তর দেয়, "এই দোষ তো সবার মধ্যেই থাকে।" এটা হলো নিজের দোষের সঙ্গে আপস করা।

২। কখনো কখনো সাধক ভাবে, "আমি যেমন, মানুষ আমাকে তেমনভাবে বোঝে না।" এখানে সূক্ষ্মরূপে লোকৈষণা আছে। এতে সাধকের পতন হবে।

[লোকৈষণা অর্থাৎ খ্যাতি লাভের ইচ্ছা]

৩। শরীরধারী মানুষের মধ্যে পরিপূর্ণতা নেই, সবার মধ্যেই কিছু না কিছু দোষ থাকে। অতএব এই নীতিতে থাকা যায় না যে "আমরা কেবল দোষহীন ব্যক্তির থেকেই শিখব।" এমন ভাবলে কারো থেকেই কিছু শেখা যাবে না।

তবে হ্যাঁ, গুরু যেন সাধারণ ব্যক্তিদের থেকে অবশ্যই অত্যুত্তম হন। অর্থাৎ যার কথায়-কাজে মিল ও শাস্ত্রীয়তা আছে।

[যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ। তেন যাযাৎ সতাং মার্গং তেন গছন্ন রিষ্যতে ॥ মনু০ [৪।১৭৮] = যে পথে পিতা এবং পিতামহ গমন করেছেন সেইপথে সন্তানও গমন করবে। কিন্তু 'সতাম্'= যদি পিতা এবং পিতামহ সৎপুরুষ হন তবে তাদের পথে চলবে এবং যদি পিতা, পিতামহ দুষ্ট হয় তবে তাদের পথে কখনও চলবে না। কারণ সৎপুরুষ ও ধর্মাত্মা পুরুষদের পথে চললে কখনও দুঃখ হয় না।- সত্যার্থ প্রকাশ, ৪র্থ সমুল্লাস।'যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি।' এটি তৈত্তিরীয়োপনিষদের [১।১১] বচন ।এর অভিপ্রায়, মাতা, পিতা ও আচার্য নিজ সন্তান ও শিষ্যদেরকে সর্বদা সত্য উপদেশ দেবেন এবং এও বলবেন -আমাদের যা যা ধর্মসঙ্গত কর্ম আছে সেগুলি গ্রহণ করবে এবং যা যা দুষ্ট কর্ম সেগুলো পরিত্যাগ করবে। যা সত্য বলে জানবে তা প্রকাশ ও প্রচার করবে, কোন পাষণ্ড ও দুষ্টাচারী মানুষকে বিশ্বাস করবে না।- সত্যার্থ প্রকাশ, ২য় সমুল্লাস]

৪। দুর্বল ব্যক্তি ভাবে "আমার দোষগুলো যেন সবার মাঝে প্রকাশ না পায়, নাহলে অপমান হবে।" অথচ একজন যোগাভ্যাসী ভাবে "সবার সামনে আমার দোষ বলা হোক, যাতে অবমান হয় এবং আমি সংশোধিত হতে পারি।"

[অবমান অর্থাৎ নিজের মধ্যে বিনীত ভাব আসে]

৫। অনেকসময় মানুষ বিশ্বাস করে না — "ঈশ্বরও জাগতিক গুরুদের মতো সহায়তা করেন।"

৬। যে ব্যক্তি নিজের দোষ ও ভুলে দুঃখবোধ করে না, সে কখনো সংশোধিত হতে পারে না।

৭। কখনো কেউ ভাবতে পারে "আমি বৈদিক যোগপথ বুঝে ও বিজ্ঞানীদের

কথাও বুঝে এমন নতুন, সহজ যোগপদ্ধতি আবিষ্কার করব, যাতে তাড়াতাড়ি ও সহজে চূড়ান্ত লক্ষ্য পাওয়া যাবে।" এ ভাবনা বিভ্রম। কারণ ঋষিগণ প্রদত্ত যোগপথই সবচেয়ে সহজ ও চূড়ান্ত। তাতে সংশোধন করার চেষ্টা যোগবিধানে জটিলতা আনে, অর্থাৎ তা যোগবিরুদ্ধ।

৮। যখন দোষী ব্যক্তি তার নিজের দোষেরও সমর্থন করতে থাকে, তখন সে আরও পক্ষপাতদুষ্ট, একগুঁয়ে ও হঠকারী হয়ে পড়ে।

[যখন কোনো ব্যক্তি নিজেরই স্পষ্ট দোষকে সমর্থন করতে শুরু করে, তখন তা নিছক ভুল নয়, একপ্রকার আত্মপ্রবঞ্চনা হয়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থায় সে যুক্তিকে অবজ্ঞা করে, সত্যকে অস্বীকার করে এবং বিবেককে বিকল করে ফেলে।দোষকে গ্রহণ করার পরিবর্তে যখন সে তাকে রক্ষা করতে চায়, তখন তার চিত্তে পক্ষপাত জন্ম নেয়—নিজের প্রতি পক্ষপাত, যা তাকে অন্যদের ন্যায্য মত ও সমালোচনার প্রতি বদ্ধ করে তোলে। ধীরে ধীরে এই পক্ষপাত তার স্বভাব হয়ে ওঠে; সে একগুঁয়ে হয়ে পড়ে, এবং পরিণামে সত্য থেকে দূরে সরে গিয়ে হঠকারিতার পথে পা বাড়ায়।এমন মানসিকতা আত্মোন্নতির পথে প্রধান বাধা, কারণ দোষ স্বীকারই উন্নতির প্রথম ধাপ। পক্ষান্তরে, দোষের পক্ষে সওয়াল করা মানে সেই দোষকে পুষ্ট করা, যা ব্যক্তিত্বকে ভেতর থেকে ক্ষয় করে। অতএব আত্মশুদ্ধির জন্য অপরিহার্য হলো, ব্যক্তি যেন সত্যনিষ্ঠ হয়, দোষ দেখলে লজ্জা নয়, সংশোধনের সাহস দেখায়।]

৯। যোগ্যতা কম থাকাকালেও যদি সম্মানের আকাঙ্ক্ষা অবশিষ্ট থাকে, তবে যোগ্যতা বাড়লে তা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়।

[যখন কোনো ব্যক্তির যোগ্যতা স্বল্প, তবুও তার মধ্যে যদি সম্মান বা উচ্চ মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা প্রবলভাবে বিরাজ করে, তবে তা নিজের সীমাবদ্ধতাকে

অগ্রাহ্য করে অহংকারে পরিণত হয়। কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষা যদি তখনও অবশিষ্ট থাকে, যখন সে সত্যিকার অর্থে যোগ্য হয়ে ওঠে, তখন তা বহুগুণে বাড়ে এবং কখনো কখনো আত্মম্ভরিতায় পরিণত হয়। যোগ্যতা অর্জনের সাথে সাথে যদি বিনয় না বাড়ে, তবে সম্মানলোভ মানুষকে আত্মসমালোচনার অযোগ্য করে তোলে। সে নিজের কৃতিত্বকেই সার্বভৌম ভাবতে শুরু করে এবং পরনিন্দা, হিংসা, আত্মশ্লাঘার পথে ঝুঁকে পড়ে। সতর্ক থাকা প্রয়োজন, যেন সম্মানপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা আমাদের চরিত্রে বিষ ছড়িয়ে না দেয়। প্রকৃত যোগ্যতা তখনই পূর্ণতা পায়, যখন তা বিনয়, সহনশীলতা ও স্বতঃস্ফূর্ত আত্মদান দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়।]

১০। যতক্ষণ না পাঠ্য ও শ্রুত বিষয়গুলো অনুভবের বিষয় করা না যায় ততক্ষণ অগ্রগতি হয় না।

[যা বইতে পড়েছি ও যা গুরুমুখে শুনেছি সেগুলোকে জীবনে পালন করতে হবে। যতক্ষণ সেগুলোকে পালন না করে উপলব্ধি করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো উন্নতি হবে না]

১১। যে ব্যক্তি মূল ও গৌণ জিনিসগুলোর পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারে না সে ব্যর্থ হবে।

১২। অতিরিক্ত আশা বা দৃঢ় বিশ্বাসে অহং [গর্ব] না আসে, এই বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত। অহং থেকে বাঁচতে ঈশ্বরকে সব কিছু সমর্পণ করো, সমস্ত ক্ষমতা ঈশ্বরপ্রদত্ত বলে মনে করো।

১৩। আমরা পরিশ্রম এড়িয়ে চলতে চাই। তাই প্রমাণসিদ্ধ ও সিদ্ধান্তরূপ কথাগুলোও অনুসরণ করি না, জীবনে তা গ্রহণ করি না।

[মানবপ্রকৃতির এক দুর্বল দিক হলো—পরিশ্রম এড়িয়ে চলার প্রবণতা। শাস্ত্র ও সাধুসন্তদের অভিজ্ঞতায় যেসব তত্ত্ব প্রমাণসিদ্ধ ও সিদ্ধান্তরূপে প্রতিষ্ঠিত

হয়েছে, সেগুলোর যথাযথ অনুসরণ করতে আমরা প্রাকৃতভাবে অনিচ্ছুক হই। কারণ সেগুলো জীবনে আনতে হয় সাধনা ও কষ্টস্বীকারের দ্বারা। আমরা জ্ঞানে সম্মত হলেও, কর্মে অনুগত হই না। ফলে ধর্মের মর্ম না হৃদয়ে আসে, না জীবনে নেমে আসে। শাস্ত্রবাক্য কেবল পাঠ করে নয়, তা জীবনব্রত করে তবেই ফল দেয়। কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল স্বস্তির পন্থা খোঁজে, সে সেই সিদ্ধান্তগুলোকেও উপেক্ষা করে, যেগুলো তার মোক্ষের পথে আলোকরশ্মির মতো সহায়ক। অতএব, সত্যপথের যাত্রীকে পরিশ্রমকে ভয় না করে বরং সাধনার রসেই আত্মার আশ্রয় খুঁজতে হবে।]

১৪। আমাদের জীবনে এমন বহু আচরণ থাকে, যা আমাদের লক্ষ্যপথে বাধা সৃষ্টি করে, তবু আমরা তা ভালো বা প্রিয় মনে করে করতে থাকি, বা সে দিকেই নজর দেই না।

১৫। অনেকসময় কঠোর ভাষা ব্যবহার করেও মানুষ টের পায় না সে কঠোরভাবে বলছে।

১৬। মানসিক দোষগুলোকে পুরোপুরি নির্মূল করা যায় না, যতক্ষণ না সমাধি লাভ হয়।

১৭। কর্তব্য-অকর্তব্য, ধর্ম-অধর্মের চূড়ান্ত মানদণ্ড বা চূড়ান্ত প্রমাণ হচ্ছে 'ঈশ্বর' তথা 'বেদ'। আমরা তা নীতিগতভাবে মানি, কিন্তু স্বার্থবিরোধ আসলেই আমরা ঈশ্বর ও বেদের কথা ছেড়ে দিই। 'যতক্ষণ অব্দি নিজে স্বার্থসিদ্ধ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বর ও বেদের কথা মানি' এই দোষ দূর করা আবশ্যক।

কুসংস্কার

১। সংস্কারের কারণে বা অনিচ্ছাকৃত ভুলের ফলে যে কুসংস্কার হয় তা তুলনামূলকভাবে হালকা হয়, কিন্তু সচেতনভাবে সুখভোগ করে করা ভুল বা কুসংস্কার অনেক বেশি দৃঢ় হয়। এগুলো মুছে ফেলা অনেক পরিশ্রম ও সময়সাপেক্ষ।

২। যা কিছু সৃষ্টি হয়, তা ধ্বংস হয়। যেটা তৈরি করা যায়, সেটাও নাশ করা যায়। একই তত্ত্ব অনুযায়ী কুসংস্কারগুলোও নিয়ন্ত্রণ করা, দুর্বল করা এবং ধ্বংস করা সম্ভব।

৩। যেমন আমরা আমাদের দুঃখের সর্বস্তরে বিরোধিতা করি, তা দূর করার জন্য কঠোর চেষ্টা করি, নিজে কষ্ট সহ্য করেও নাশ করি, তেমনি যোগাভ্যাসীকে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।

[যেমন আমরা আমাদের দুঃখ ও কষ্টের প্রতিটি স্তরে শক্তিসঞ্চয় করে বিরোধিতা করি, তা দূর করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করি, কখনো নিজের কষ্ট সহ্য করেও সমস্যা নিবারণের পথে অগ্রসর হই—তেমনি একজন যোগাভ্যাসীকে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করতে হবে।

কুসংস্কার হলো অন্ধবিশ্বাস ও মিথ্যার জন্মভূমি, যা ব্যক্তির অন্তরকে অন্ধকারে ডুবিয়ে দেয় এবং আত্মোন্নয়নের পথে বাঁধা সৃষ্টি করে। যোগের সাধক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব এই ভ্রান্ত ধারণাগুলোকে চ্যালেঞ্জ জানানো, তাদের নির্মূল করা এবং সত্যের আলো ছড়িয়ে দেওয়া। **ঋগ্বেদ বলে (৪.৩৩.৬) 'সত্যমূচুর্নর এবা হি চক্রুরনু'** অর্থাৎ মানব সত্য বলুক ও সত্য অনুযায়ী আচরণ করুক। এই আদর্শই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ প্রতিরোধ। যোগীর সংগ্রাম কেবল নিজের জন্য নয়, সমগ্র সমাজের মুক্তির জন্য।]

৪। অভ্যন্তরীণ দোষের পরিমাণ বহিরাগত দোষের চেয়ে অনেক বেশি। সমাধি ছাড়া জন্ম-জন্মান্তরের সূক্ষ্ম কুসংস্কার দেখা যায় না, তা দূর করার কথা তো দূরের কথা।

৫। তপস্যাহীন ব্যক্তি কুসংস্কারে আসক্ত হলে ভোগের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আর তপস্বী ব্যক্তির মনে কুসংস্কারের উদয় হলে সে তার বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং জিততে পারে।

৬। অবিচ্ছিন্ন ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা জন্ম-জন্মান্তরের কুসংস্কার ক্ষীণ হয়, আঘাত পেয়ে ভঙ্গুর হয় এবং ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়।

৭। জ্ঞানকে চেষ্টা করে ধরে না রাখলে, তা পরিশুদ্ধ না করলে এবং অজ্ঞানতা দূর না করলে কুসংস্কার নির্মূল করা যায় না, পাপপ্রবৃত্তি থেকে মুক্তিও লাভ করা যায় না।

৮। যে ব্যক্তি এটা ভাবে “জন্ম-জন্মান্তরের কুসংস্কার থাকবেই, এসব ধীরে ধীরে চলে যাবে”। কিন্তু এসব চিন্তা আসলে সময়সাপেক্ষ বলে পরিশ্রম এড়ানোর কথাবার্তা। কারণ এমন ব্যক্তি দ্রুত দূর করার যোগ্য কুসংস্কার দূর করার চেষ্টাও আলস্যদোষে বন্ধ করে দেয়।

উচিত ও অনুচিত আচরণ

১। কোনো বস্তু যত বেশি লাভজনক, তাকে তত বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। যেহেতু ঈশ্বর আমাদের জন্য সর্বোচ্চ লাভজনক, তাই তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া ও সর্বোচ্চ ভালোবাসা করা উচিত। এটিই যথাযথ আচরণ।

২। ঈশ্বরের সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক গড়তে কর্তব্য পালন ও অকর্তব্য পরিহার করা জরুরি।

৩। যে ব্যক্তি ন্যায়বুদ্ধি ত্যাগ করে, সে মানবতা থেকে দূরে সরে যায়। ঈশ্বর, যোগী, ঋষি আমাদের সর্বোচ্চ মঙ্গল চান। তাদের কথা না মানা অন্যায়, বুদ্ধিভ্রষ্ট, পক্ষপাতমূলক আচরণ ও অধর্ম।

৪। ঈশ্বরের সঙ্গে যথার্থ আচরণ জীবের সর্বোচ্চ লক্ষ্য অর্জনের নিশ্চিত মাধ্যম ও ভিত্তি। যথার্থ আচরণে সফলতা, অন্যায় আচরণে ব্যর্থতা নিশ্চিত। ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক যেন পিতা-পুত্র, গুরু-শিষ্য, রাজা-প্রজা, বন্ধু-বান্ধব, উপাসক-উপাস্য, স্বামী-সেবক, ব্যাপ্য-ব্যাপক এর মতো হয়।

৫। আত্ম-পর্যালোচনা করো, নিজেকে প্রশ্ন করো। আমি কী উপরের সম্পর্কগুলোর মধ্যে কোনটি কেমন করে রাখি? যদি আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে এমন আচরণ না করি, তা হলে আমরা ঈশ্বরের প্রতি অনুচিত আচরণ করি।

৬। ন্যায়সঙ্গতভাবে পাওয়া সম্মানে ঈশ্বরের সম্মানের থেকেও বেশি নিজের সম্মান চাওয়া অন্যায়। কারণ অধিকাংশ গুণ লাভে ঈশ্বরের অবদান বেশি, তাই ঈশ্বরকে যথাযথ সম্মান না দেওয়া অন্যায়। এমন অবস্থায় ব্রহ্মলাভ সম্ভব নয়।

সুখ ও দুঃখ

১। ছোটবেলা থেকে সুখের পেছনে ছুটছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না প্রকৃত সুখ কী এবং কিভাবে পাওয়া যায়।

২। সবাই সুখ ও সুখের উপকরণ চায়, তবে তারা যাকে সুখ ও সুখের উপকরণ মনে করে তার ভিত্তি পরিবর্তন হলে পথ বদলে যায় — কেউ হয়ে যায় ভৌতিকবাদী, কেউ আধ্যাত্মিকবাদী।

[অর্থাৎ ভোগ করতে হবে নিরাসক্তভাবে। কিন্তু যদি কেউ আসক্ত হয়ে যায় তবে তার আর উন্নতি হয় না]

৩। পার্থিব সুখ সঠিকভাবে উপভোগ করতে পারে সে, যে নিয়ন্ত্রণ সহকারে ভোগ করে; যেমন যারা মাত্রাতিরিক্ত খেয়ে রোগাক্রান্ত হয় তারা সুখও নিতে পারে না।

৪। যোগী বা ব্রহ্মবিদ্ হতে চাওয়া ব্যক্তি পঞ্চেন্দ্রিয়ের সুখ নিয়ে সফল হতে পারে না।

৫। "বিষয় ভোগে বিশুদ্ধ সুখ আছে" — এই মিথ্যা ধারণা মানুষকে এগুলো ত্যাগ করতে উৎসাহিত করে না।

৬। একজন ইন্দ্রিয়ের সুখ নেওয়া ব্যক্তি তার অন্য ইন্দ্রিয়ের সুখ থেকে দূরে থাকতে পারে না।

৭। একটি ইন্দ্রিয়ের সুখ পেলে অন্য ইন্দ্রিয়েরও উত্তেজনা হয়, যা অনিবার্য। চোখে মিষ্টি দেখলে জিহ্বায় আগ্রহ হয়, মুখে জল আসে, হাতও এগিয়ে যায়; সুন্দর রূপের শব্দ শুনলে তাকে ছুঁওয়ার আকাঙ্ক্ষাও হয়। তবে যদি এক ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণে থাকে, অন্যদের নিয়ন্ত্রণও আসে।

[একটি ইন্দ্রিয় সুখ অনুভব করলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও তার প্রতি উত্তেজিত হয়ে ওঠে এটা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম। আবেগ ও আকর্ষণ একের পর এক ইন্দ্রিয়কে প্রভাবিত করে। বেদও বলে **'তৃষ্টামি তৃষ্টিকা বিনা বিষাতক্যসি' (অথর্ববেদ ৭.১১৩.২)** অর্থাৎ বিষয়ভোগের তৃষ্ণা লোভময়ী, বিষরূপী এবং বিষাক্ত।যখন একজন সাধক একটি ইন্দ্রিয়কে শক্তিশালীভাবে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়, তখন ধীরে ধীরে অন্য ইন্দ্রিয়গুলোর নিয়ন্ত্রণও সহজ হয়। কারণ ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ চিত্তের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সম্ভব, এবং চিত্ত নিয়ন্ত্রণেই মানুষের মুক্তি নিহিত। অতএব, ইন্দ্রিয়ের প্রলুব্ধিতে পড়ে বিচলিত না হয়ে, একটিকে নিয়ন্ত্রণ করে ধীরে ধীরে সকল ইন্দ্রিয়কে আত্মশাসন করার চর্চাই প্রকৃত সাধনার চাবিকাঠি।]

৮। অনেকেই মনে করে “ইন্দ্রিয়ের সুখের ইচ্ছাকে জয় করা যায়”, কিন্তু ‘আমি জয় করব, দ্রুত জয় করব’ এই মনোভাব ও প্রচেষ্টা খুব কম।

[শুধু কামনা-বাসনা জয় করা যায় ভাবলেই হবে না, সাধক যদি জয় করতে চায় তাহলে সেই চিন্তা ও সংকল্প রেখে যথোপযুক্ত কর্মও করতে হবে]

৯। ঋষি বলেন ‘ভোগে দুঃখ আছে, তবু আমরা জাগতিক সুখ ভোগ করি’। এই সাধনার অবস্থায় ঋষির কথা মেনে নিতে হবে, না হলে যোগে সফল হওয়া যাবে না।

১০। দুঃখগ্রস্ত ব্যক্তি ঈশ্বরের দিকে আগ্রহী হতে পারে না, তার একাগ্রতা থাকে না।

১১। “পরিশ্রম করলে দুঃখ লাভ হয়” এটা ভুল ধারণা। পরিশ্রমে সর্বদা সুখ পাওয়া যায়।

১২। যদি তপস্যাকে লক্ষ্য লাভের উপায় বলে মনে করি তবে তা দুঃখ দেয় না, বরং তপস্যায় আনন্দ আসে। যদি তা না করি তবেই দুঃখ হয়।

সত্য ও মিথ্যা

১। নিজের ইচ্ছামতো কোনো কিছু মানা মানবধর্ম নয়। প্রমাণসিদ্ধ কথাই ধর্ম। এটিই সত্য গ্রহণ ও অসত্য ত্যাগের অর্থ।

২। মন চঞ্চলতা থামলে সত্য-অসত্য, কর্তব্য-অকর্তব্য, ন্যায়-অন্যায় পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

৩। নিজের মনে একটি মূল সিদ্ধান্ত রেখো “আমার কেবল সত্যই চাই, সত্যই গ্রহণ করব”। এতে ব্যক্তি অটল থাকে, দোদুল্যমান হয় না, সবসময় বিজয়ী

হয়। কিন্তু যারা সত্য না চেয়ে সুখ চায়, তাদের যোগের পথে সবসময় ব্যর্থতাই লাভ হয়।

[নিজের অন্তরস্থলে একটি মূল সিদ্ধান্ত স্থির করে নেওয়া উচিত "আমার কেবল সত্যই চাই, সত্যই গ্রহণ করব।" এই সিদ্ধান্ত যেন হৃদয়ের মজ্জাগত ব্রত হয়ে ওঠে। কারণ যারা সত্যকেই প্রাধান্য দেয়, তারা কখনো দোদুল্যমান হয় না। তাদের চিত্ত স্থির, দৃঢ়, এবং লক্ষ্যসচেতন থাকে। সত্য অন্বেষণের এই সংকল্পই ব্যক্তিকে জীবনের প্রতিটি স্তরে স্থিতি ও জয় এনে দেয়। কারণ যোগের পথ আত্মশুদ্ধি, ঈশ্বরোপাসনা ও চিত্তনিরোধের যে কঠিন অনুশীলন তা কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব, যাঁরা অসত্য ও সুখলোভকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু যারা সত্য নয়, সুখকেই চায় মানে, আরাম, প্রশংসা, গৌরব, ব্যক্তিগত সুবিধাকে প্রাধান্য দেয় তারা যোগপথে চিরকাল ব্যর্থ হয়। কারণ তারা পথে নেমেই সন্ধান করে পরিণাম, ত্যাগে নয়, চায় অর্জন। সত্যকামী ব্যক্তিই চূড়ান্তভাবে সিদ্ধিলাভ করে, কারণ সে জানে সত্যই পরমেশ্বর, সত্যই মুক্তি, সত্যই যোগ।]

৪। যাদের মন ভয়গ্রস্ত থাকবে তারা কখনো পুরোপুরি সত্যবাদী হতে পারে না।

৫। সত্যবাদী প্রায়শই ভাববে, "লাভের সময় সামান্য মিথ্যা বললেই লাভবান হওয়া যায় তাই বলি।" কিন্তু উচিত সব সময় সত্য বলা।

৬। বিশুদ্ধ সত্য চাওয়া ব্যক্তি সম্মান-অপমান, লাভ-ক্ষতির পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে কখনো পিছিয়ে যায় না; সম্মান-অপমানে প্রভাবিত হলে মিথ্যা বলবেই।

৭। সত্যবাদী ব্যক্তি মৃত্যুকেও মেনে নেবে কিন্তু ঈশ্বরের উপাসনা ও আজ্ঞা কখনো ত্যাগ করবে না।

[সত্যবাদী ব্যক্তি জীবনের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষাও মেনে নিতে প্রস্তুত থাকে, এমনকি মৃত্যুকে স্বীকৃতি দিলেও সে **ঈশ্বরের উপাসনা ও আজ্ঞা কখনো পরিত্যাগ করে না।** কারণ তার বিশ্বাস অটুট যে, ঈশ্বরের আদেশ ও উপাসনা হল জীবন ও মৃত্যুর অন্তর্ভুক্ত সব পরিস্থিতিতে স্থায়ী মুক্তির পথ। ধর্ম নষ্ট হলে সবকিছু নষ্ট, আর ধর্ম রক্ষা করলে সবকিছু রক্ষা। এই নীতিতে স্থির থেকে সত্যবাদী ব্যক্তি আত্মার চিরস্থায়ী কল্যাণের জন্য সর্বদা ঈশ্বরের পথ অনুসরণ করে। অতএব, মৃত্যুর ভয়ের মোকাবিলা করেও তার ঈশ্বরভক্তি অটল থাকে, কারণ তার অন্তর জানে ঈশ্বরের আজ্ঞা ছাড়া কোনো প্রকৃত নিরাপত্তা নেই।]

৮। সত্যবাদী এমন হবে না যে শুধু পড়বে, পড়াবে ও উপদেশ দেবে কিন্তু নিজে পালন করবে না। এমন অবস্থা সে সহ্য করতে পারবে না। হয়তো সে সম্পূর্ণ পালন করতে পারছে না, তবে সংগ্রাম ও চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

৯। অনেক পরিশ্রম ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরই ব্যক্তি সবসময় সত্য বলতে পারে; নইলে অজ্ঞতাবশত অনেক মিথ্যা বলে।

[সতত সত্যভাষণ একটি সহজাত গুণ নয়; বরং বহু পরিশ্রম, আত্মসমীক্ষা ও দীর্ঘকালীন পরীক্ষার মাধ্যমে এটি অর্জন করতে হয়। কারণ মানুষ অনেক সময় সত্য-মিথ্যার প্রকৃত সীমা জানে না, ফলে অনিচ্ছায়ও অসত্য উচ্চারণ করে ফেলে। জ্ঞান ও বিবেকের শুদ্ধতা ব্যতীত সত্যের উপলব্ধি অসম্ভব। সত্যই ধর্ম। এই সত্য অনুসন্ধান ও অনুশীলনের ফলে মন প্রগাঢ় হয়, বাক্য শুদ্ধ হয়, চরিত্র দীপ্ত হয়। তাই একজন সত্যবাদী ব্যক্তি কেবল নৈতিক নয়, আধ্যাত্মিক পথেও অগ্রসর হয়। কিন্তু এই অবস্থায় পৌঁছতে হলে নিজের জ্ঞানকে ক্রমাগত পরিশুদ্ধ করতে হয়, যা কঠিন তপস্যার ফল।]

১০। স্বজ্ঞানে মিথ্যা বলার পর যাকে মিথ্যা বলা হয়েছে তার সামনে যত দ্রুত তার ভুল স্বীকার করবে তত ভালো। দেরী হলে দোষ বাড়ে ও মিথ্যা বলার

স্বভাব পেয়ে বসে।

১১। সত্য একা একাই জয়ী হয় না, পুরুষার্থ করে জয়ী করতে হয়।

[সত্য স্বয়ংসিদ্ধ হলেও তা একাই জয়ী হয় না। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে, রক্ষা করতে এবং বাস্তবতায় পরিণত করতে প্রয়োজন পুরুষার্থ অর্থাৎ, নিষ্ঠাবান চেষ্টা, অধ্যবসায় ও সাহসিকতা। গীতা (২.৫০) বলে 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্' অর্থাৎ সফলতার জন্য কর্মে দক্ষতা বা পরিশ্রম অপরিহার্য। সত্যকে কখনো সহজে গ্রহণ করা হয় না, বরং তার জন্য সংগ্রাম করতে হয়, প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে হয়। সুতরাং, শুধুমাত্র সত্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়; সেই সত্যকে জীবনে প্রয়োগের জন্য সচেতন কর্ম ও আত্মত্যাগ অবলম্বন করাও জরুরি। পুরুষার্থের সঙ্গে মিলিত সত্যই চূড়ান্ত জয়ী হয়।]

১২। ঈশ্বরের ব্যবস্থায় সর্বদা সত্যই জয়ী হয়। মানবিক ব্যবস্থায় অন্যায় হতে পারে, তাই মিথ্যা আপাতদৃষ্টিতে জিততে দেখা যায়। চূড়ান্ত জয়-পরাজয় ঈশ্বরের ব্যবস্থায় হয়; জয় মানে মোক্ষপ্রাপ্তি, পরাজয় মানে মোক্ষহীনতা।

১৩। শব্দপ্রমাণ হিসেবে ঋষি ও বিজ্ঞানীদের উভয়ের তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য, কিন্তু সত্যের পরিমাণ ঋষিদের মধ্যে বেশি। তবে সব বিজ্ঞানীরা পক্ষপাতমুক্ত হতে পারেন না, দেশপ্রেম বা অর্থলোভে মিথ্যা বলেও থাকেন।

ঈশ্বরের উপাসনা

১। যদি মন সন্ধ্যা-উপাসনার সময় স্থির না থেকে এলোমেলো বাইরে বিষয়ে ঘুরে বেড়ায়, বুঝবে ঈশ্বরের নয় বরং সংসারের উপাসনা চলছে।

[যখন সন্ধ্যা বা উপাসনার সময়ে মন স্থির না থেকে সংসারসংক্রান্ত নানা বিষয়ে বিচরণ করতে থাকে, তখন বুঝতে হবে এটি প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা নয়

বরং সংসারোপাসনা চলছে। উপাসনার উদ্দেশ্য হলো ঈশ্বরকে স্মরণ ও অনুভবের মাধ্যমে চিত্তকে শুদ্ধ করা, অন্তরকে স্থিত ও প্রসন্ন করা। কিন্তু যদি সেই সময়ে মন সংসারের ভাবনা, লেনদেন, সম্পর্ক, সুখ-দুঃখে বিভোর থাকে, তবে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর নয়, মায়ার উপাসনাই ঘটে। মন যেখানে আবিষ্ট হয়, উপাসনা মূলত সেখানেই ঘটে এই দার্শনিক সত্য স্মরণে রাখতে হবে। সুতরাং সন্ধ্যা-উপাসনায় ঈশ্বরচিন্তায় মনোযোগ স্থাপন করাই আত্মোন্নতির প্রধান শর্ত। মন ঈশ্বরে নিবিষ্ট না হলে উপাসনার বাহ্য রূপ থেকেও তেমন কোনো ফল লাভ হয় না।]

২। উপাসনার সময় যখন ব্যক্তি সন্ধ্যার মন্ত্রের পরিপূর্ণ অর্থ না বুঝে কেবল সংক্ষিপ্ত ভাবার্থেই সন্তুষ্ট থাকে, তখন থেকেই অলসতা ও অবহেলার শুরু। ধীরে ধীরে সে ছোট ভাবার্থ করতেও অলস হয়ে পড়ে, পরে শুধু মন্ত্র পাঠ করে এবং শেষ পর্যন্ত মন্ত্রও ত্যাগ করতে পারে।

[মন্ত্রের অর্থ জেনে বুঝে পাঠ ও সেই অনুযায়ী আচরণ করলে তারপরেই মন্ত্রের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যায়। ভাবার্থ আমাদের মন্ত্রের গুরুত্ব ও পূর্বাপর প্রসঙ্গ বুঝতে সাহায্য করে। কিন্তু আমরা যদি ঈশ্বরের উপদেশরূপ বেদমন্ত্রকে সূক্ষ্মভাবে না বুঝতে পারি তাহলে ঈশ্বরের কৃপা আমরা কখনোই পরিপূর্ণভাবে লাভ করতে পারব না]

৩। সাধক পরীক্ষা করুক। দিনভর আমার ঈশ্বরের উপাসনা বেশি হয় না কি পার্থিব বস্তু ও ভোগের উপাসনা বেশি? যদি ভোগের উপাসনা বেশি হয়, তাহলে স্পষ্ট ঈশ্বরলাভ এখনও প্রধান লক্ষ্য নয়।

[এজন্য সর্বকর্মে ঈশ্বরের স্মরণ করতে হবে। সমস্ত কর্ম পরমেশ্বরেই সমর্পণ করতে হবে।]

মন নিয়ন্ত্রণ

১। সুখ, স্বাধীনতা, নির্ভয়তা ও আত্মশুদ্ধির জন্য মন নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন।
২। মন স্থির হলে সব ইন্দ্রিয় তাদের বিষয়াসক্তি থেকে দূরে সরে যায়।
৩। একাকীত্বে একাগ্রতা বেশি হয় যদি পূর্ব স্মৃতি না ওঠে। কারণ একাকী থাকলে নতুন কোনো বিষয় আসে না।
৪। যাদের সংসারে আসক্তি বেশি, তারা মন নিয়ন্ত্রণে সংগ্রাম করে দ্রুত ক্লান্ত হয়।

[যারা সংসারে অতিরিক্ত আসক্ত, অর্থাৎ পারিবারিক, বস্তুগত বা ভাবগত বন্ধনে গভীরভাবে আবদ্ধ, তারা মনকে নিয়ন্ত্রণে **দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়েন।** কারণ এই আসক্তি মানসিক শক্তি ক্ষয় করে, চেতনার মুক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে। ভোগের চাহিদা বা বাসনা ত্যাগ করলেই মুক্তির পথ সুগম হয়। যখন মন সংসারের আবেগ, লোভ ও মায়ার জালে আটকা পড়ে, তখন আত্মার শুদ্ধি ও মুক্তি কঠিন হয়ে যায়। এর ফলে মননিয়ন্ত্রণে ধৈর্য কমে যায় এবং সাধনার পথ কঠিন হয়ে ওঠে। সুতরাং, সংসারের আসক্তি যত কম থাকবে, মন নিয়ন্ত্রণের সংগ্রাম তত সহজ ও ফলপ্রসূ হবে, যা শাস্ত্রীয় মুক্তির মূলমন্ত্র।]

৫। যদি মনে হয় মন্দ সংস্কার থামছে না, তবে বুঝবে সে মনকে জড় মনে করছে না, সচেতন ভাবছে। মনকে জড় চিন্তা করলে ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়।
৬। বিভ্রান্তির ভাবনাগুলো মনে উঠতে না দিতে চাইলে আগে থেকেই মন ও বুদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়।

সমাপ্ত